রুমঝুম রুমঝুম	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
হংসমিথুন ওগো	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
ওর নিশীথ সমাধি	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
কুহু কুহু কোয়েলিয়া	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
নীলাম্বরি শাড়ি পরি	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
মেঘবিহীন খর বৈশাখে	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
ঝর ঝর ঝরে	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
খেলে নন্দের আঙিনায়	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
মুরলী ধ্বনি শুনি	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম
হে মাধব হে মাধব	নজরুল ইসলাম	নজরুল ইসলাম

রবীন্দ্রসঙ্গীত

কাল মিলন চাও বিরহী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(অসম্পূর্ণ এই তালিকায় রেকর্ড-ক্যাসেট-সিডি-র প্রকাশকাল নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে উল্লেখ করা গেল না)

গ্রন্থসূত্র

১ *খোলা জানালার ধারে*, মৃণাল চক্রবর্তী, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ২০০১।

২ *জলছবির রঙ*, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ২০০২।

শতবর্ষের আলোকে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী

নির্বাণ বসু

শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীকে বিনম্র শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের সময়ে প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে বিশেষ যুগে অধ্যাপক ত্রিপাঠী ইতিহাসচর্চা করেছেন তার প্রেক্ষাপট ও বৈশিষ্ট্যগুলি।

ইতিবৃত্ত বা পুরোনো যুগের কথা লিপিবদ্ধ করার ঐতিহ্য পাশ্চাত্য, মধ্যপ্রাচ্য বা চিনের মতো যে কোনো প্রাচীন সভ্যতার ক্ষেত্রেই সুদীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান। ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু জ্ঞানচর্চার সুনির্দিষ্ট শাখা হিসাবে 'ইতিহাস' বা History-র আবির্ভাব অনেক পরে, মোটামুটি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ইউরোপীয় পরিমণ্ডলে। গ্রীক রোমান ইতিহাসচর্চার পুরোনো ঐতিহ্যের বদলে রাজারাজড়ার প্রশস্তিমূলক গাথা রচনার পরিবর্তে তথ্য ও যুক্তির মিশেল ঘটিয়ে সৃষ্টি হলো এই আধুনিক ইতিহাসের। ভারতেও আধুনিক ইতিহাসচর্চার সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষের দিক থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলেই। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা ব্রিটিশ আমলের সাম্রাজ্য বিস্তার ও আধুনিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সরকারী ইতিহাস লেখা শুরু করলেন। অন্যদিকে ভারতীয় ইতিহাস লেখকদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল প্রাচীন ভারতের গৌরব গাথা তুলে ধরে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদকে উদ্দীপ্ত করা। ইতিহাসচর্চার এই প্রারম্ভিক পর্যায়ে ভারতীয় লেখকদের অনেকক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের অভাব দেখা গেছে, জাতীয়তাবাদী আবেগ উদ্দীপনায় চাপা পড়েছে ঐতিহাসিকের তথ্যনিষ্ঠা। ১৯২০-র দশক থেকে আচার্য যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের হাত ধরেই বাংলাদেশে আধুনিক অর্থে ইতিহাসচর্চার প্রকৃত সূত্রপাত। এঁদের প্রায় সকলেরই আদর্শ ছিলেন রাংকে, যিনি ইতিহাসকে বুঝতে চাইতেন 'সত্যের দর্পণ' হিসাবে, প্রকৃত কী ঘটেছে সেই সত্যের উদ্ঘাটনই রাংকের কাছে ঐতিহাসিকের প্রধান দায়িত্ব। পরবর্তী ঐতিহাসিকদের অনেকের উপরই লুই নেমিয়ারের ইতিহাসচিন্তার ছাপ পড়লো। মহৎ লক্ষ্য বা আদর্শের চাইতে গোষ্ঠীগত ক্ষুদ্র স্বার্থ ইতিহাসের প্রধান বিচার্য বলে পরিগণিত হলো। তারও পরে মার্ক্সীয় ইতিহাসচিন্তার আলোকে ভারত ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা শুরু হলো, যেখানে ইতিহাস নিরন্তর শ্রেণী সংগ্রামের কাহিনী মাত্র। এর বিকল্প হিসাবে ১৯৭০-এর দশকে সাবঅলটার্ন ইতিহাসচর্চার আবির্ভাব। তাছাড়া ইতিহাস শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ রইলো না, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সবকিছুই তার পরিসীমার অন্তর্ভুক্ত হলো। চিন্তা ও চেতনার ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস, খাদ্যের ইতিহাস, পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস, পরিবেশের ইতিহাস, খেলাধূলার ইতিহাস, অবসর বিনোদনের ইতিহাস—ইতিহাস হয়ে দাঁড়াল বিচিত্রপথগামী। ফ্রান্সের 'আনাল স্কুলের' ঐতিহাসিকরা তুললেন সামগ্রিক ইতিহাস বা total history-র কথা। অধ্যাপক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধ 'A Note on the Changing Pattern of Historical Research on Modern India in West Bengal (*Indian Historical Research*

Since Independence, edited by Tarasankar Banerjee, Calcutta, 1986) স্বাধীনতা-উত্তর পরবর্তী চার দশকের পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসচর্চার উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন 'The Passage from Rankean ideals to Namiers concepts and thence to Marxist approach marked the changing pattern of research over the last four decades.'

মোটামুটিভাবে এই চারটি দশকই ছিল অমলেশ ত্রিপাঠীর শিক্ষাজীবন শেষ করে কর্মজীবনের উপান্তে পৌঁছনোর সময়কাল, অর্থাৎ তাঁর সারস্বত সাধনার সময়কাল। দেশ ও বিদেশের সব ধরনের ইতিহাসচর্চার সঙ্গেই তিনি নিবিড়ভাবে পরিচিত ছিলেন। সব স্রোতেই তিনি অবগাহন করেছেন, কিন্তু কখনও গা ভাসাননি। সবকটি ধারাকেই যে তিনি গভীর অনুসন্ধিৎসা, কঠোর অধ্যবসায় ও অসামান্য মননের দ্বারা আত্মস্থ করেছেন, তার ছাপ রয়েছে তাঁর সমগ্র চিন্তায়, চেতনায়, লেখনীতে।

অমলেশ ত্রিপাঠীর জন্ম ১৯২১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার সূতাহাটা থানার দেভোগের এক উৎকল ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারে। পিতা স্থিতধী ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শ্যামাচরণ ত্রিপাঠী ও মাতা ধর্মপ্রাণা হিমাঙ্গিনী দেবীর নয় সন্তানের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম। শহর কলকাতার আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেননি, তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ছিল আভিজাত্যপূর্ণ। সেই অর্থে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত প্রথম প্রজন্মের মানুষ তিনি। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় নিবেদিতপ্রাণ। গুরুতর শারীরিক অসুস্থতাও কখনোই পাঠচর্চার আগ্রহ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তমলুক হ্যামিলটন হাইস্কুল থেকে সারা বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর চলে আসেন শহর কলকাতায়, বসবাস করতে থাকেন হিন্দু হোস্টেলে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আই.এ. (১৯৩৮) ও অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলেজে সতীর্থ হিসাবে বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়, সিদ্ধার্থশংকর রায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, দিলীপকুমার বিশ্বাস ও সুনীলকুমার সেনের মতো পরবর্তীকালে নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত যশস্বীদের। এরপর বিষয় পরিবর্তন করে ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৪২)। এবারেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। অঙ্কশাস্ত্র, ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস সর্বত্রই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি ও অগাধ ব্যুৎপত্তি। সে যুগের অন্যতম সেরা ছাত্র বলে পরিচিত অমলেশবাবু প্রকৃত অর্থেই এনসাইক্লোপেডিস্ট ছিলেন, যা তাঁর প্রজন্ম থেকেই ক্রমশ বিলীয়মান হচ্ছিল। চিন্তা ও পাঠের এই বহুমুখীনতাই তাঁর ইতিহাসবোধ ও চর্চায় এক নতুন মাত্রা এনেছিল।

মফঃস্বলের ঐতিহ্যমণ্ডিত এক বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠচর্চা শুরু করা অমলেশবাবু এরপর পৌঁছে গেলেন আন্তর্জাতিক শিক্ষার আঙিনায়। ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং ১৮৭০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যেকার আমেরিকার ইতিহাস দর্শন নিয়ে Richard Hofstadter-এর অধীনে গবেষণা করে A.M. ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণা সন্দর্ভটি ১৯৫৬ সালে 'Evolution of History in America, 1870-

1910' নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। আমেরিকা থেকে এরপর তিনি পাড়ি দেন ইংলন্ডে।

লন্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজের (SOAS) সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক C.H. Philips-এর কাছে 'Trade and Finance in the Bengal Presidency (1793-1833)'-এর উপর গবেষণা করে Ph.D. ডিগ্রি অর্জন করেন। এই সঙ্গেই ভারতের অর্থনীতির ইতিহাসচর্চায় এক নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়। ইউরোপীয় এজেন্সি হাউসগুলির কার্যকলাপ ও বাংলার তৎকালীন বাণিজ্যের উপর তার প্রভাব নিয়ে গভীর বিশ্লেষণধর্মী এই কাজ। ১৯৫৬ সালে কলকাতা থেকে গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হলে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন : 'I have been struck by the wide range and depth of the author's research among unprinted sources, minute accuracy in handling facts and figures, sobriety of judgement and courage in exploding popular myths' ক্রান্তদর্শী যদুনাথ সরকার ড. ত্রিপাঠীর রচনার যে সব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, পরবর্তী জীবনে শুধু অর্থনৈতিক ইতিহাসচর্চায় নয়, ইতিহাসের অন্যান্য বহু শাখায় গবেষণার সময় কখনো তা থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অকৃপণ, তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণে নির্মোহ এবং বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার তিনি চেষ্টা করে গেছেন।

অমলেশ ত্রিপাঠী শিল্পী : প্রকাশ দাশ

দেশে ফিরে এসে (১৯৪৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। কর্মজীবন শুরু কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে। এরপর কিছুকাল সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে পড়িয়ে যোগ দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। তাঁর ছাত্র ও কর্মজীবন অর্থাৎ ১৯৪০, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশককে বলা যেতে পারে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসে বিভাগের স্বর্ণযুগ। প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সুশোভন সরকারের বিভাগীয় প্রধানের উত্তরাধিকার বহন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। অমলেশবাবু কিন্তু অক্লেশে বিভাগীয় মর্যাদাকে আরো উচ্চতর স্তরে তুলে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। বিভাগীয় প্রধান থাকার সময় সহকর্মী হিসাবে পান তপন রায়চৌধুরী, দিলীপকুমার বিশ্বাস ও অশীন দাশগুপ্তের মতো কৃতবিদ্য শিক্ষকদের। ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের অবসর গ্রহণের পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগ দেন। কিছুকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং সিন্ডিকেট সদস্যও ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন (১৯৭৭)। কর্মজীবন

থেকে অবসর নেন ১৯৮৬ সালে। ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের আধুনিক ভারত শাখার সভাপতি হয়েছিলেন ১৯৫৬ সালে আর সাধারণ সভাপতি হয়েছিলেন আলিগড়ে অনুষ্ঠিত ৫৫তম বার্ষিক সম্মেলনে (১৯৯৪-৯৫)।

ড. ত্রিপাঠীর কাছে গবেষণা শুধুমাত্র ডিগ্রি লাভের জন্য ছিল না। ছিল তাঁর সারা জীবনের সারস্বত সাধনার অংশ। অর্থনৈতিক ইতিহাসেই তিনি আবদ্ধ থাকেননি। এরপর তিনি আকৃষ্ট হন রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি। তাঁর কাছে রাজনৈতিক ইতিহাস শুধুমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্রাজ্যবিস্তার বা সাংবিধানিক ইতিহাস নয়, বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল জাতীয়তাবাদী পর্ব। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের ইতিহাসচর্চায় মননের ইতিহাস বা History of Ideas-এর গবেষণা কার্যে একটা বড় ফাঁক আছে। তিনি চেয়েছিলেন অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজমনন ইত্যাদি সব কিছুকে নিয়ে একসঙ্গে বিচার করতে, অর্থাৎ 'total history'। সম্ভবত এই ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ফ্রান্সের আনাল স্কুলের (Annales School) এবং তাঁদের মানসিকতার (mentalities) বিবর্তনের উপর গুরুত্ব দানের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চা বা মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চা কোনওটাই তাঁকে পুরোপুরি প্রভাবিত করেনি, যদিও তাঁদের কারো বক্তব্যই তিনি পুরোপুরি বর্জন করেননি। স্থানকাল ভেদে যে ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাগুলি তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে, তাই তিনি গ্রহণ করেছেন। কোনও তাত্ত্বিক গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে ছিল না।

রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর তাঁর প্রথম কাজ *The Extremist Challenge* (১৯৬৭)। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে চরমপন্থার উদ্ভব, সশস্ত্র জাতীয়তাবাদের উৎস, প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এটি মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এই গ্রন্থটিতে অধ্যাপক ত্রিপাঠী দেখাতে চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষে চরমপন্থী আন্দোলনের সবকটি দিক এবং সারা দেশ জুড়ে এর প্রভাব।

এই রাজনৈতিক ইতিহাসচর্চা ধারায় অধ্যাপক ত্রিপাঠীর দ্বিতীয় রচনাটি হলো *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭*। সম্ভবত অধ্যাপক ত্রিপাঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এটি (১৯৯০)। তাঁর দীর্ঘদিনের পঠনপাঠন ও গবেষণার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ সর্বভারতীয় পটভূমিকায় বিচিত্র উপাদানের ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে প্রথম নিরপেক্ষ ও নির্মোহ মূল্যায়ন। সংখ্যাতত্ত্বের নিপুণ ব্যবহারে যেমন তা এক তন্নিষ্ঠ মাত্রা যোগ করেছে, তেমনি পটুত্ব দেখিয়েছে কংগ্রেস, বিপ্লবী, সাম্যবাদী ও লীগ রাজনীতির, অহিংস ও সহিংস পদ্ধতির; কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও স্থানীয় শক্তিগুলির; এবং হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার জটিল টানাপোড়েনের বিশ্লেষণে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কেন বিভিন্ন শ্রেণী প্রতিবাদ করেছে, কোন্ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল কংগ্রেসের মঞ্চে যোগ দিয়েছে বা ত্যাগ করেছে, কী ধরনের নেতৃত্ব উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তকে এক মহাজাতীয় সংগ্রামে সামিল করেছে, তার দ্বন্দ্ব ও মিলন-মুখর ঐকতান দুইই এতে ধ্বনিত। ব্রিটিশ, হিন্দু ও মুসলমান সব পক্ষের পরিবর্তনমান রণকৌশল কীভাবে দেশভাগের ট্রাজেডি ঘটালো তার মর্মন্তুদ বিবরণ এতে বর্ণিত। সমসাময়িক সাহিত্যের ব্যবহারে সমৃদ্ধ, অভিনব উল্লেখের আলোকে

উদ্ভাসিত, সংগ্রামের স্তর, পর্ব, পদ্ধতি ও পরিণতি বিশ্লেষণে অনন্য, মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনাময় এই গ্রন্থ ইতিহাস-সাহিত্যে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন।

এই বৃহৎ কাজের পাশাপাশি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত *ফ্রিডম স্ট্রাগল* (১৯৮২) গ্রন্থে বিপান চন্দ্র ও বরুণ দে-র সঙ্গে ডঃ ত্রিপাঠী সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজ ভাষায় ভারতের জাতীয় সংগ্রামের মূল বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহও ডঃ ত্রিপাঠীর দৃষ্টি এড়ায়নি। *দেশ* পত্রিকায় ১৯৯০-এর দশকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ একত্র করে প্রকাশিত হয় *স্বাধীনতার মুখ* (১৯৯৮)।

ডঃ ত্রিপাঠীর গবেষণার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চা। এর সূত্রপাত দেখি এন.কে. সিন্‌হা সম্পাদিত *The History of Bengal 1757-1905* ((১৯৬৭) গ্রন্থে 'Bengali Literature in the 19th Century' শীর্ষক প্রবন্ধে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় রেনেশাঁর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের একটি তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর এই চিন্তাই পরিণতি লাভ করে *ইতালির রেনেশাঁস ও বাঙালির সংস্কৃতি* (১৯৯৪) নামক একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে। ইতালির রেনেশাঁসের পুরো বিষয়টি আত্মস্থ করার ফলেই অতি অল্প পরিসরে ইউরোপীয় রেনেশাঁর মতো বিরাট বিষয়টি তার পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আর একটি বড় অবদান হলো *Vidyasagar : The Traditional Moderniser* (১৯৭৪)। এটি নিছক জীবনীগ্রন্থ নয়, বিদ্যাসাগর শিক্ষা, সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে উনিশ শতকে কিভাবে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, তার বিশ্লেষণ। ডঃ ত্রিপাঠীর মতে, নিঃসঙ্গ প্রমিথিউসের মতো বিদ্যাসাগর বাংলার বিস্তারিত দিগন্তে বিচরণ করেছেন। সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ইতিহাসকেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর জীবনাবসানের পরে প্রকাশিত হয় *ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ* (১৯৯৯)। *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধ এখানে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। প্রবাদ, পক্ষপাত, ব্যক্তিপূজা ও জনশ্রুতির বাইরে এসে কিভাবে কালজয়ী মহামানবদের জীবন ও কর্মের পর্যালোচনা করতে হয়, ডঃ ত্রিপাঠী তার দুর্লভ স্বাক্ষর এখানে রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হচ্ছে মৌলবাদী সংকীর্ণতার বাইরে গিয়ে ধর্মের মধ্যে যে উদারনৈতিক মানবতাবাদী সমন্বয়বাদী দিক আছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা।

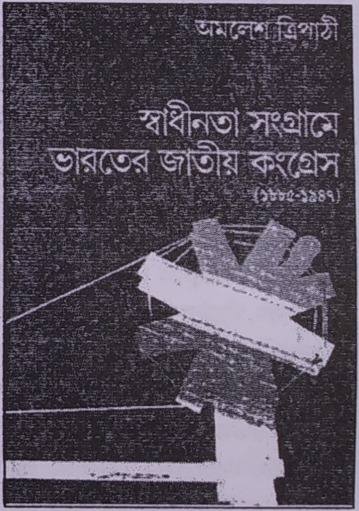

অধ্যাপক ত্রিপাঠীকে বরাবরই আকর্ষণ করেছে ইতিহাসচর্চার ইতিহাস বা historiography। বস্তুতপক্ষে তাঁর গবেষক জীবন শুরুই হয়েছিল মার্কিন ইতিহাসচর্চার ইতিহাসকে কেন্দ্র করে।

অন্যান্য দিক নিয়ে বহু গবেষণার পাশাপাশি এই ইতিহাসচর্চার ইতিহাসে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হলো *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক* (১৯৮৬) নামক গ্রন্থটি। মোট এগারোটি প্রবন্ধের সংকলন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে *ইতিহাস* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেগুলি সমসাময়িক ইতিহাসচর্চার আলোকে পুনর্বিচার, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রীক ইতিহাসচর্চা, সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবের ইতিহাসচর্চা সংকলনটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। ইতিহাস দর্শনের প্রথম পদক্ষেপ রূপে গ্রন্থটি আনন্দ-সুরেশ স্মৃতি পুরস্কারে সম্মানিত হয়।

ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র, গবেষক ও লেখক হিসাবে পরিচয়ের পাশাপাশি অমলেশ ত্রিপাঠীর আর একটি বড় পরিচয় হলো ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে। গবেষণা আর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান— এই দুটি আলাদা ধারা তাঁর কাছে মিলে এক হয়ে গিয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাশভারী, কিছুটা অন্তর্মুখী এই মানুষটি অনেকের কাছেই ছিলেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তিনিই নিয়ম করে ঠিক সময়মতো ক্লাস নিতেন, ব্যস্ততার অজুহাতে কখনও ক্লাস বাদ দিতেন না। অত্যন্ত যত্ন করে ক্লাস নোট তৈরি করতেন, ধরাবাঁধা গতের নোট না হয়ে আধুনিকতম গবেষণা সংযোজিত হয়ে তা অতি উচ্চমানের ইতিহাস পরিবেশনায় পরিণত হতো। ইতিহাসের সঙ্গে আসতো সাহিত্য, চিত্রকলা, সংগীত, অন্যান্য দেশের ইতিহাস, সমকালীন প্রসঙ্গ সব কিছুই। ভাষা ছিল সাহিত্যিক সুষমামণ্ডিত। ভাষণ হতো মনোগ্রাহী।

প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতাকালীনই তাঁর বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে যোগ দেবার পর তিনি ঐতিহ্যশালী এই বিভাগকে নতুন করে সাজিয়ে নেবার চেষ্টা করেন। এক ঝাঁক তরুণ অধ্যাপক তাঁর আমলেই ইতিহাস বিভাগে যোগ দেন, যাঁদের আধুনিক মানসিকতা ও উৎসাহকে তিনি সাদরে বরণ করেন। তাঁর আমলেই ইতিহাস বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের থেকে বিশেষ অনুদানপ্রাপ্ত কেন্দ্রের স্বীকৃতি পায়। বিভাগ কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস থেকে হাজরা রোডে নিজস্ব 'হিস্ট্রি বিল্ডিং'-এ চলে আসে। উচ্চমানের বিভাগীয় জার্নালের সূত্রপাত ঘটে। বড়ো আকারে তৈরি হয় বিভাগীয় রেফারেন্স লাইব্রেরি। ভিজিটিং প্রফেসর ও ফেলো হিসাবে বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বিভাগের অন্যতম বলে স্বীকৃত হয়।

ইতিহাসের পাঠক্রমের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। তাঁর কাছে ইতিহাস কোনও নীরস মৃত বিষয় ছিল না, ছিল সতত পরিবর্তনশীল এক ক্ষেত্র। কাজেই পাঠক্রম স্থবির না রেখে যুগোপযোগী করতে তিনি সতত উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রাতারাতি নিত্যনতুন পরিবর্তনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৬০ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ত্রৈমাসিক সাম্মানিক পাঠক্রম চালু হলো এবং ১৯৬৮ সালে সাম্মানিক ও পাসকোর্সের পাঠক্রমের পরিবর্তন ঘটলো, প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে সেই পাঠক্রম তৈরিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।

এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ১৯৭৬ সালে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের ব্যাপক সংস্কার করেন, পুরোনো কিছু স্পেশাল পেপারের বদলে কিছু নতুন বিষয়ের আগমন ঘটে। ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় আবার স্নাতক স্তরের পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ ঘটে। ইতিহাসের বিভিন্ন শাখায় যে সব নতুন বইপত্র বেরোচ্ছে, তার সন্ধান রাখতেন তিনি। পাঠক্রমে শুধু নয়, পাঠচর্চায় ও প্রশ্নপত্রে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট হতেন।

গবেষণা পরিচালক হিসাবে তিনি সংখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না, ছিলেন গুণগত মানে। বাছা বাছা ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা তিনি পরিচালনা করেছেন। এই গবেষকরা পরবর্তীকালে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন যে কখনও নিজের মত তিনি ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দেননি, অযথা হস্তক্ষেপ করেননি তাঁদের কাজে, কিন্তু বিপুল তথ্যভাণ্ডারের দরজা তাঁদের সামনে খুলে দিয়েছেন। তাঁর পরিচালিত উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্মের মধ্যে আছে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে সব্যসাচী ভট্টাচার্যের 'Some Aspects of the Fiscal and Financial Policy and Financial System of the Government of India, 1858-1872' (১৯৬৬), সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Social Mobility in Bengal in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries' (১৯৮৮), রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে ইংরেজ কোম্পানীর শাসনকালের সময়ের উপর ভারতী সেনগুপ্তর (রায়) 'British Policy Towards Hyderabad' (১৯৭৩)। বাকি অধিকাংশ গবেষণাই জাতীয়তাবাদী পর্বের রাজনীতির উপর : হাসি মুখোপাধ্যায়ের (বন্দ্যোপাধ্যায়) 'Political Activity of the Liberal Party in India 1919-1937' (১৯৭৭), গার্গী রায়ের (চক্রবর্তী)'Gandhi and the Hindu-Muslim Problem, 1919-1929' (১৯৭৭), প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'Aspects of Urban Nationalist Politics in Bengal, 1937-1947' (১৯৮৭), গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়ের (বন্দ্যোপাধ্যায়) 'Impact of Gandhi on Bengal Politics, 1921-41' (১৯৮০), জাপান থেকে আগত গবেষক মাসায়ুকি উসুদার 'Aswini Kumar Datta's Role in the Political, Social and Cultural Life of Bengal' (১৯৭৮) এবং উড়িষ্যা থেকে আগত গবেষক বিজয়চন্দ্র রথের 'Unrest in Princely State of Orissa : Dhenkanal and Talcher 1938-47' (১৯৯০)। তাঁর বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি একদিকে যেমন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের তাঁর কাছে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তেমনই বিপ্রদেশ শুধু নয়, বিদেশ থেকেও গবেষকরা তাঁর কাছে ছুটে এসেছিলেন। আবার বিষয়বস্তুর দিক দিয়েও অর্থনীতি, সমাজ, ঔপনিবেশিক শাসন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতির বিভিন্ন ধারায় তাঁর অবাধ গতির পরিচয়ও রয়েছে তাঁর ছাত্রদের এইসব গবেষণা কর্মের মধ্যে। ১৯৭৪ সালে গান্ধী-লেকচারার হিসাবে লন্ডনে যান। এছাড়া রাশিয়া, ফ্রান্স, জাপানে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে ভ্রমণ করেন।

অবসর গ্রহণের (১৯৮৬) পর আরো প্রায় এক দশক ডঃ ত্রিপাঠী জীবিত ও কর্মক্ষম ছিলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিলেও, এমনকি শেষের দিকে দু-তিন বছর দুরারোগ্য কর্কট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েও তাঁর জ্ঞানচর্চায় কোনো ছেদ পড়েনি। পড়া ও

লেখায় তিনি ছিলেন সমান অক্লান্ত। পরিণত বয়সে ১৯৯৮ সালে চিরবিদায় নিলেন অমলেশ ত্রিপাঠী। তাঁর অনুজ ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী, যাঁকে যথার্থই আখ্যা দিয়েছেন 'রেনেশাঁস ম্যান' হিসাবে। ডঃ ত্রিপাঠীর চিরবিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটলো ইতিহাস জগতের এক উজ্জ্বল যুগের।

আরও বিস্তারিত তথ্যর জন্য দ্রষ্টব্য :

১। প্রণব চট্টোপাধ্যায়— 'আমার শিক্ষক ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী' (দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত 'আমার শিক্ষক' প্রবন্ধমালার অন্তর্ভুক্ত), কলকাতা ২০১০।

২। অর্পিতা গায়েন—'ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ও তাঁর ইতিহাস চেতনা : ১৯২১-১৯৯৮', এম.ফিল. গবেষণা সন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

৩। অরুণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত *ঐতিহাসিক* পত্রিকা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।

৪। নির্বাণ বসু—'শিক্ষক ও ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী', *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, প্রাক্-শারদ, ২০১২ ('শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষকতা' বিশেষ সংখ্যা)।

দিলীপকুমার বিশ্বাস : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেবব্রত চক্রবর্তী

এত বড় একজন মানুষের জন্মশতবর্ষে আমরা ছাত্ররা তাঁর স্মৃতিতর্পণ করবো না সে কি করে হয়? কিন্তু বছর আসবার আগেই বিষম বিপত্তি শুরু হয়ে গেল। এনআরসি, এনপিআর, আরও কত কিছু! আর তার ঠিক পরই পরই করোনা। যুগান্তরের গ্লানি এসে পড়েছে দোরগোড়ায়, তাকে তো আগে সামাল দিতে হবে!

তাই তাঁকে নিয়ে নমো নমো করে এই শ্রদ্ধা জানাবার চেষ্টা। প্রস্তাবে সম্পাদক সম্মত হলেন, তাই তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

যদিও কলেজে পড়বার সময় আমি তাঁর ইতিহাস ক্লাসের ছাত্র ছিলাম না, তবু জীবনের পরবর্তী সময়ে যখন যোগাযোগ হলো, তখন তাঁর সঙ্গে আমার অধ্যাপক-ছাত্রের দূরত্ব রইলো না আর। নাড়া বেঁধেছিলাম অবিশ্যি তাঁর কাছে পিএইচডি-র জন্য। তবে সেকথা এখানে বলবার নয়। প্রেসিডেন্সি থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের প্রধান হয়ে সংস্কৃত কলেজে এসেছিলেন আমাদের পাঠের প্রায় শেষদিকে, ১৯৬৯-এ। কিন্তু সখ্য হলো গিয়ে আমি যখন ১৯৮৪-তে পাইকপাড়া অঞ্চলে বাস করতে এলুম।

অনেকে তাঁর বৈদগ্ধ্য নিয়ে অনেক কথা বলবেন, ওসব নিয়ে বলতে আমি খুব একটা উৎসাহ পাই না। ভাবি মানুষটাই তো কত বড় তাঁর লেখা বইয়ের চেয়ে। আর আমি তাঁকে যেভাবে দেখেছি, তাতে একটি নিটোল আড্ডাবাজ, ঘরোয়া আটপৌরে মানুষকে নিয়ে কথা বলবো নাই বা কেন? যদি ছবি আঁকবার চেষ্টা করি, তাহলে সে ছবিটা হবে তাঁরই আনন্দঘন মূর্তি। কিন্তু সেটাই কি সোজা নাকি? ছড়ানো তাঁর জীবন! জলে, স্থলে কোথায় নেই তিনি?—মুঠো করে ধরে রাখতে পারি, তেমন সাধ্য কি আমার?

গানটা তাঁর জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। খেয়াল শিখেছেন রীতিমতো ওস্তাদের কাছে। গান নিয়ে যে কত প্রসঙ্গ এসেছে আড্ডায়! কখনও কখনও গেয়েও শুনিয়েছেন। একদিন কোথা থেকে এক সঙ্গে ফিরছি। বললেন, এই গানের জন্যেই পিএইচডি-টা করা হলো না। গোটা শীতটাই তো উচ্চাঙ্গ সংগীতে কলকাতা জমজমাট! নিতাইদা, সেতারী নিতাই বসুর সঙ্গে বসে গেলে তো কথাই নেই। কত গম্ভীর আলোচনা, সে তো গান নিয়েই নয়, জগৎ ও জীবনের অখণ্ড সাঙ্গীতিক ঐকতানেও তাঁরা নিবিষ্ট হয়ে উঠতেন। একদিন মনে আছে মোহন কাননে (পাইকপাড়া অঞ্চলের) একটা অনুষ্ঠান হল (কুমার বোসের তবলাও ছিল সেদিন), দিলীপবাবু সামনে বসে। বললেন, নিতাইবাবু, সব শেষে একটু লচাও ঠুংরিটা যদি বাজান। নিতাইদা সেদিন লচাও ঠুংরির গৎ বাজিয়ে আমাদের মোহিত করে দিয়েছিলেন।

এরপরই শুরু হলো তাঁর বিচার বিশ্লেষণ। পরের আড্ডায়। ওই জায়গাটায় ভাবো তো নিতাইবাবুর সুরটাকে— না না, ওটা ওখানে ঠিকই আছে, আর হবেই বা কি করে, সেতারে তো ওই জায়গাটা ঠিক আদায় হবে না, আহা হতো যদি এস্রাজ তাহলে জমে যেত ঠিক! এ তো গণপত রাও ভাইয়ার আশ্চর্য সৃষ্টি! বলতে পার ধ্রুপদের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া

শিক্ষক ও ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী

নির্বাণ বসু

বিংশ শতাব্দীতে সারা ভারতে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকার, কালীকিংকর দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ সেন, নীহাররঞ্জন রায়, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের মতো বাঙালি পণ্ডিত, গবেষক ও শিক্ষকেরা এক উল্লেখযোগ্য দিক্‌চিহ্ন রেখে গেছেন। সেই গৌরবদীপ্ত ধারার এক উজ্জ্বল প্রতিভূ ছিলেন অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী। মৃত্যুর এক দশক অতিক্রম করে আজকের প্রজন্মের ছাত্র সমাজের কাছে তিনি অনেকটাই বিস্মৃত, যদিও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন ও থাকবেন তাঁর কয়েকটি অমূল্য গ্রন্থের মাধ্যমে। আলোচ্য নিবন্ধে তাঁরই প্রদর্শিত পথে যথাসম্ভব অবজেকটিভিটি (objectivity) বজায় রেখে তাঁর একটি সার্বিক ছবি তুলে ধরার চেষ্টা করবো। অবশ্য তাঁর মতো এক বৃহৎ ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন, আমার মতো তাঁর 'ক্লাসে বসা' এক অতি সাধারণ ছাত্রের পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব।

তাঁর জন্ম ১৯২১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার সুতাহাটা থানার দেভোগের এক উৎকল ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারে। পিতা স্থিতধী ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন শ্যামাচরণ ত্রিপাঠী ও মাতা ধর্মপ্রাণা হিমাগিনী দেবীর নয় সন্তানের মধ্যে তিনি কনিষ্ঠতম। শহর কলকাতার আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি, তাঁর পারিবারিক পরিবেশ ছিল গ্রামীণ আভিজাত্যপূর্ণ। সেই অর্থে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত প্রথম প্রজন্মের মানুষ তিনি। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনায় নিবেদিত প্রাণ। গুরুতর অসুস্থতাও কখনোই পাঠচর্চার আগ্রহ থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে নি। তমলুক হ্যামিলটন হাইস্কুল থেকে সারা বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করে ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর চলে আসেন শহর কলকাতায়, বসবাস করতে থাকেন হিন্দু হোস্টেলে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে আই.এ. (১৯৩৮) ও অর্থনীতিতে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৪০)। এরপর বিষয় পরিবর্তন করে ইতিহাসে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৯৪২) প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। একই সঙ্গে আইন অধ্যয়ন করে তাতেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। অঙ্কশাস্ত্র, ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস সর্বত্রই ছিল তাঁর স্বচ্ছন্দ গতি ও অগাধ ব্যুৎপত্তি। সে যুগের অন্যতম 'সেরা ছাত্র' বলে পরিচিত অমলেশবাবু প্রকৃত অর্থেই ছিলেন 'এনসাইক্লোপেডিস্ট', যা তাঁর প্রজন্ম থেকেই ক্রমশ বিলীয়মান হচ্ছিল। চিন্তা ও পাঠের এই বহুমুখীনতা তাঁর ইতিহাসবোধ ও চর্চায় এক নতুন মাত্রা দিয়েছিল।

মফস্বলের ঐতিহ্যমণ্ডিত এক বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠচর্চা শুরু করা অমলেশবাবু এরপর পৌঁছে গেলেন আন্তর্জাতিক শিক্ষার আঙিনায়। ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান এবং ১৮৭০ থেকে ১৯১০-এর মধ্যেকার আমেরিকার ইতিহাস দর্শন নিয়ে Richard Hofstadter-এর অধীনে গবেষণা করে A.M. ডিগ্রি লাভ করেন। গবেষণা সন্দর্ভটি ১৯৫৬ সালে 'Evolution of History in America, 1870-

1910' কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। আমেরিকা থেকে তিনি পাড়ি দেন ইংলণ্ডে। লণ্ডনের স্কুল অফ ওরিয়েন্টাল এণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজের (SOAS) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক C. H. Philips-এর কাছে 'Trade and Finance in the Bengal Presidency, 1793-1833'-এর উপর গবেষণা করে Ph. D ডিগ্রি অর্জন করেন। এই সঙ্গেই ভারতের অর্থনীতির ইতিহাস চর্চায় এক নতুন দুয়ার উন্মোচিত হয়। ১৯৫৬ সালে কলকাতা থেকে গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হলে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে লেখেন, 'I have been struck by the wide range and depth of the author's research among unprinted sources, minute accuracy in handling facts and figures, sobriety of judgement and courage in exploding popular myths.' ক্রান্তদর্শী যদুনাথ সরকার ড. ত্রিপাঠীর রচনার যেসব বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন, পরবর্তী জীবনে শুধু অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চায় নয়, ইতিহাসের অন্যান্য বহু শাখায় গবেষণার সময় কখনো তা থেকে তিনি বিচ্যুত হন নি। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অকৃপণ, তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণে নির্মোহ এবং বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছেন তিনি।

দেশে ফিরে এসে (১৯৪৭) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এডুকেশন সার্ভিসে যোগ দেন। কর্মজীবন শুরু কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজে। এরপর কিছুকাল সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে পড়িয়ে যোগ

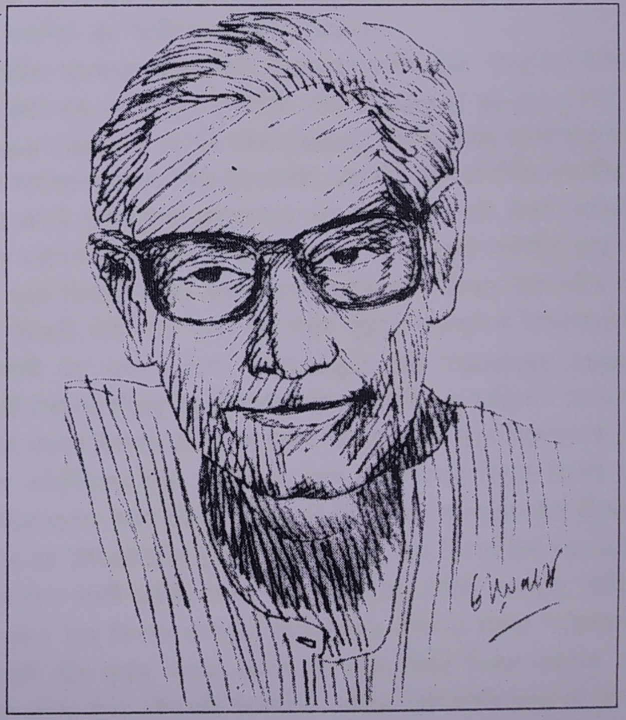

অমলেশ ত্রিপাঠী *শিল্পী : চারু খান*

দেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ১৯৫৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। তাঁর ছাত্র ও কর্মজীবন অর্থাৎ ১৯৪০, ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশককে বলা যেতে পারে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের স্বর্ণযুগ। অধ্যাপক সুশোভন সরকারকে তিনি পেয়েছিলেন শিক্ষক ও পরে সহকর্মী হিসাবে বিভাগীয় প্রধান রূপে। প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব সুশোভনবাবুর উত্তরাধিকার বহন করা খুব সহজ কাজ ছিল না। বিভাগীয় প্রধান থাকার সময় সহকর্মী হিসাবে পান তপন রায়চৌধুরী, দিলীপ বিশ্বাস ও অশীন দাশগুপ্তের মতো কৃতবিদ্য শিক্ষকদের। ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহের অবসর গ্রহণের পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে যোগ দেন। কিছুকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন এবং সিন্ডিকেট সদস্য ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য হয়েছিলেন (১৯৭৭)। কর্মজীবন থেকে অবসর নেন ১৯৮৬ সালে। ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের আধুনিক ভারত শাখার সভাপতি হয়েছিলেন ১৯৫৬ সালে আর সাধারণ সভাপতি হয়েছিলেন আলিগড়ে অনুষ্ঠিত ৫৫তম বার্ষিক সম্মেলনে।

ড. ত্রিপাঠীর কাছে গবেষণা শুধুমাত্র ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্য ছিল না। ছিল তাঁর সারা জীবনের সারস্বত সাধনার অংশ। অর্থনৈতিক ইতিহাসেই তিনি আবদ্ধ থাকেন নি। এরপর তিনি আকৃষ্ট হন রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি। তাঁর কাছে রাজনৈতিক ইতিহাস শুধুমাত্র যুদ্ধবিগ্রহ, সাম্রাজ্যবিস্তার বা সাংবিধানিক ইতিহাস নয়, বিশেষভাবে তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল জাতীয়তাবাদী পর্ব। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতের ইতিহাসচর্চায় মননের ইতিহাস বা History of Ideas-এর গবেষণাকার্যে একটা বড় ফাঁক আছে। তিনি চেয়েছিলেন অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি, সমাজমনন ইত্যাদি সব কিছুকে নিয়ে একসঙ্গে দেখতে অর্থাৎ 'total history'। সম্ভবত এই ব্যাপারে তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন ফ্রান্সের আনাল স্কুলের (Annales School) এবং তাঁদের মানসিকতার উপর গুরুত্ব দানের মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চা, উগ্র জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চা বা মার্কসবাদী ইতিহাসচর্চা কোনওটাই তাঁকে পুরোপুরি প্রভাবিত করেনি, যদিও তাঁদের বক্তব্য তিনি পুরোপুরি বর্জন করেন নি। স্থানকাল ভেদে যে ব্যাখ্যা বা ব্যাখ্যাগুলি তাঁর কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে, তাই তিনি গ্রহণ করেছেন। কোনও তাত্ত্বিক গোঁড়ামি তাঁর মধ্যে ছিল না। সেইদিক থেকে তাঁকে অবশ্যই একজন 'empiricist' বলা যেতে পারে।

এই ধারার প্রথম কাজ The Extremist Challenge (১৯৬৭)। বঙ্গভঙ্গের পটভূমিতে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে চরমপন্থার উদ্ভব, সশস্ত্র জাতীয়তাবাদের উৎস, প্রকৃতি ও পরিণতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এটি মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এই গ্রন্থটিতে অধ্যাপক ত্রিপাঠী দেখাতে চেয়েছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষে চরমপন্থী আন্দোলনের সবকটি দিক এবং সারা দেশজুড়ে এর প্রভাব।

এই রাজনৈতিক ইতিহাসচর্চা ধারায় অধ্যাপক ত্রিপাঠীর দ্বিতীয় রচনাটি হলো 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭'। সম্ভবত অধ্যাপক ত্রিপাঠীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এইটি (১৯৯০)। তাঁর দীর্ঘদিনের পঠনপাঠন ও গবেষণার ফলশ্রুতি এই গ্রন্থ সর্বভারতীয় পটে বিচিত্র উপাদানের ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নিরপেক্ষ ও নির্মোহ মূল্যায়ন। সংখ্যাতত্ত্বের নিপুণ ব্যবহারে যেমন তা এক তন্নিষ্ঠ মাত্রা

যোগ করেছে, তেমনি পটুত্ব দেখিয়েছে কংগ্রেস, বিপ্লবী, সাম্যবাদী ও লীগ রাজনীতির, অহিংস ও সহিংস পদ্ধতির, কেন্দ্র, প্রাদেশিক ও স্থানীয় শক্তির এবং হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার জটিল টানাপোড়েন বিশ্লেষণে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কেন বিভিন্ন শ্রেণী প্রতিবাদ করেছে, কোন্ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দল কংগ্রেসের মঞ্চে যোগ দিয়েছে বা ত্যাগ করেছে, কী ধরনের নেতৃত্ব উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্তকে এক মহাজাতীয় সংগ্রামে সামিল করেছে, তার দ্বন্দ্ব মিলল মুখর ঐকতান এতে ধ্বনিত। ব্রিটিশ, হিন্দু ও মুসলমান সব পক্ষের পরিবর্তনমান, রণকৌশল কীভাবে দেশভাগের ট্র্যাজেডি ঘটাল তার মর্মন্তুদ বিবরণ এতে বর্ণিত। সমসাময়িক সাহিত্যের ব্যবহারে সমৃদ্ধ, অভিনব উল্লেখের আলোকে উদ্ভাসিত, সংগ্রামের স্তর, পর্ব, পদ্ধতি ও পরিণতি বিশ্লেষণে অনন্য, মনস্তাত্ত্বিক ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনাময় এই গ্রন্থ ইতিহাস-সাহিত্যে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন।

এই বৃহৎ কাজের পাশাপাশি ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট প্রকাশিত 'ফ্রিডম স্ট্রাগল (১৯৮২) গ্রন্থে বিপান চন্দ্র ও বরুণ দে-র সঙ্গে ড. ত্রিপাঠী সংক্ষিপ্ত পরিসরে সহজ ভাষায় ভারতের জাতীয় সংগ্রামের মূল বিষয়গুলি তুলে ধরেছেন। ঔপনিবেশিক যুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি সমকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাপ্রবাহও ড. ত্রিপাঠীর দৃষ্টি এড়ায় নি। 'দেশ' পত্রিকায় ১৯৯০-এর দশকের বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ একত্র করে প্রকাশিত হয় 'স্বাধীনতার মুখ' (১৯৯৮)

ড. ত্রিপাঠীর গবেষণার আর-একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চা। এর সূত্রপাত দেখি এন. কে. সিন্হা সম্পাদিত 'The History of Bengal (1757-1905)' গ্রন্থের 'Bengali Literature in the 19th Century' শীর্ষক প্রবন্ধে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপীয় রেনেশাঁর সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের একটি তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর এই চিন্তাই পরিণতি লাভ করে ইতালির রেনেশাঁস, বাঙালীর সংস্কৃতি (১৯৯৪) নামক একটি নাতিদীর্ঘ গ্রন্থে। ইটালির রেনেশাঁসের পুরো বিষয়টি আত্মস্থ করার ফলেই অতি অল্প পরিসরে ইউরোপীয় রেনেশাঁর মতো বিরাট বিষয়টি তাঁর পক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে তাঁর আর-একটি বড় অবদান হলো 'Vidyasagar: The Traditional Moderniser' (১৯৭৪)। এটি নিছক জীবনীগ্রন্থ নয়, বিদ্যাসাগর শিক্ষা, সামাজিক ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে উনিশ শতকে কিভাবে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন তার বিশ্লেষণ। ড. ত্রিপাঠীর মতে, নিঃসঙ্গ প্রমিথিউসের মতো বিদ্যাসাগর বাংলার বিলীয়মান দিগন্তে বিচরণ করেছেন। সাংস্কৃতিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে ধর্মীয় ইতিহাসকেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর জীবনাবসানের পরে প্রকাশিত হয় 'ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ' (১৯৯৯)। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত চারটি প্রবন্ধ এখানে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। প্রবাদ, পক্ষপাত, ব্যক্তিপূজা ও জনশ্রুতির বাইরে এসে কিভাবে কালজয়ী মহামানবদের জীবন ও কর্মের পর্যালোচনা করতে হয়, ড. ত্রিপাঠী তার দুর্লভ সাক্ষর এখানে রেখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রকৃত ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হচ্ছে মৌলবাদী সংকীর্ণতার বাইরে গিয়ে ধর্মের মধ্যে যে উদারনৈতিক মানবতাবাদী সমন্বয়বাদী দিক আছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা।

অধ্যাপক ত্রিপাঠীর আর-একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হলো 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' (১৯৮৬) নামক গ্রন্থটি। মোট এগারোটি প্রবন্ধের সংকলন। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি ১৯৫০ ও ৬০-এর দশকে 'ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেগুলি সমসাময়িক ইতিহাসচর্চার আলোকে পুনর্বিচার, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রীক ইতিহাসচর্চা, সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবের ইতিহাসচর্চা, ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসচর্চা ও রুশ বিপ্লবের ইতিহাস-চর্চা সংকলনটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও গবেষক হিসাবে পরিচয়ের পাশাপাশি অমলেশ ত্রিপাঠীর অপর যে পরিচয়, তা হলো ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে। গবেষণা আর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান— এই দুটি আলাদা ধারা তাঁর কাছে মিলে এক হয়ে গিয়েছিল। প্রায় চার দশকের অধ্যাপক জীবনে ইতিহাসচর্চার নানা গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তের তিনি শুধু সাক্ষী-ই নন, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের দিশারীও ছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে যে প্রায় দু-দশক তিনি অধ্যাপনা করেছেন, তখন ছিল প্রেসিডেন্সির স্বর্ণযুগ। কলেজে তিনি পড়াতেন আধুনিক ইউরোপ ও আধুনিক ভারত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পর তিনি পড়াতেন প্রধানত আধুনিক ভারত, ইউরোপের শিল্পবিপ্লব এবং ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস। প্রেসিডেন্সি কলেজের স্বল্প সংখ্যক, বুদ্ধিদীপ্ত ও সাধারণভাবে উচ্চশ্রেণী থেকে আসা ছাত্রদের কাছে তাঁর উচ্চ মানের ইতিহাস পরিবেশনা ইতিহাস পাঠনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল। এখান থেকেই তাঁর বৈদগ্ধ্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেবার পরেই অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপদ সেন, নিশীথরঞ্জন রায়ের মতো সহযোগী শিক্ষকেরা একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। পুরনো যুগ শেষ হয়ে নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে। পছন্দমতো সহকর্মীদের নিয়ে নতুনভাবে তিনি বিভাগ সাজিয়ে নেন। আরও পরে এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষকও বিভাগে যোগ দেন, যাঁদের আধুনিক মানসিকতা ও উৎসাহকে তিনি সাদরে বরণ করেন। তাঁর আমলেই ইতিহাস বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের থেকে বিশেষ অনুদানপ্রাপ্ত কেন্দ্রের স্বীকৃতি পায়। বিভাগ কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাস থেকে হাজরায় নিজস্ব হিস্ট্রি বিল্ডিং-এ চলে আসে। উচ্চমানের বিভাগীয় জার্নালের সূত্রপাত ঘটে। বড়ো আকারে তৈরি হয় বিভাগীয় রেফারেন্স লাইব্রেরি। ভিজিটিং প্রফেসর ও ফেলো হিসাবে বহু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। বহু আন্তর্জাতিক ও জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। শত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শ্রেষ্ঠ ইতিহাস বিভাগের অন্যতম বলে স্বীকৃত হয়।

আশুতোষ অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে তাঁর পূর্বসূরী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ সেন, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ উৎকৃষ্ট মানের গবেষণা নির্দেশনার যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছিলেন, ড. ত্রিপাঠী ছিলেন তাঁদের সার্থক উত্তরসূরী। বাছা বাছা ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা তিনি পরিচালনা করেছেন। এই গবেষকরা পরবর্তীকালে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করেছেন যে, কখনও তিনি নিজের মত ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দেননি, অযথা হস্তক্ষেপ করেননি তাঁদের কাজে, কিন্তু বিপুল তথ্যভাণ্ডারের দরজা তাঁদের সামনে খুলে দিয়েছেন।

ইতিহাসের পাঠক্রমের দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল সজাগ। ড. ত্রিপাঠীর কাছে ইতিহাস কোনও নীরস মৃত বিষয় ছিল না, ছিল সতত পরিবর্তনশীল এক ক্ষেত্র। কাজেই পাঠক্রম

স্থবির না রেখে যুগোপযোগী করতে তিনি সতত উৎসাহী ছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে রাতারাতি খামখেয়ালি নিত্য পরিবর্তনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৬০ সালে যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ত্রৈবার্ষিক সাম্মানিক পাঠক্রম চালু হলো এবং ১৯৬৮ সালে সাম্মানিক ও পাশ কোর্সের পাঠক্রমের পরিবর্তন হলো, প্রেসিডেন্সি কলেজের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে সেই পাঠক্রম তৈরিতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান হিসাবে ১৯৭৬ সালে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের ব্যাপক সংস্কার করেন, পুরনো কিছু স্পেশাল পেপারের বদলে কিছু নতুন বিষয়ের আগমন ঘটে। ১৯৮০-র দশকের গোড়ায় আবার স্নাতক স্তরের পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ ঘটে। ইতিহাসের বিভিন্ন শাখায় যে সব নতুন বইপত্র বেরোচ্ছে, তার সন্ধান রাখতেন তিনি। পাঠক্রমে শুধু নয়, পাঠচর্চায় ও প্রশ্নপত্রে সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করতে সচেষ্ট হতেন।

দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, অসম্ভব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাশভারী, কিছুটা অন্তর্মুখী এই মানুষটি ছিলেন অসম্ভব মেজাজী, আপাতরুক্ষ। শুধু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে নয়, অনেক সময় সহকর্মীদের কাছেও ধরাছোঁয়ার বাইরে। নিয়ম করে সময়মতো ক্লাস নিতেন, ব্যস্ততার অজুহাতে কখনও ক্লাস বাদ পড়তো না। অত্যন্ত যত্ন করে ক্লাস নোট তৈরি করতেন, ধরাবাঁধা গতের নোট না হয়ে ইতিহাসের সঙ্গে আসতো সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, অন্যান্য দেশের ইতিহাস, সমকালীন প্রসঙ্গ সব কিছুই। ভাষা ছিল সাহিত্যিক সুষমামণ্ডিত। ভাষণ হতো মনোগ্রাহী।

তাঁর অধ্যাপনা জীবন শুরু করার চার দশকের মধ্যে ছাত্রদের মানসিকতার বহু পরিবর্তন ঘটতে থাকে। প্রযুক্তি শিক্ষার দাপটে বিশুদ্ধ কলা ও বাণিজ্য শাখায় উচ্চমানের ছাত্র কম আসতে থাকে, মধ্যমমেধার প্রাধান্য বাড়ে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণী থেকে বিপুল সংখ্যায় ছাত্র আসতে থাকে, বাড়ে কোচিং টিউশন-নির্ভরতা, দেখা দেয় পাঠ্য বই ও রেফারেন্স বই পড়ার কোন অভ্যাস না থাকা এবং ইংরেজিতে প্রাথমিক ন্যূনতম জ্ঞানের অভাব। এই অবস্থায় ড. ত্রিপাঠী ক্রমশই ছাত্রদের কাছে সুদূরের মানুষ হয়ে ওঠেন। শিক্ষকতার যে সব বৈশিষ্ট্য তাঁকে ১৯৫০-৬০-এর দশকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে মর্যাদামণ্ডিত করেছিল, পরবর্তী প্রজন্ম তাঁকে সেই মূল্য দিতে কখনোই রাজি ছিল না। তাছাড়া, চিরকাল অন্তর্মুখী আত্মমগ্ন মানুষটির কাছে ছাত্রছাত্রীদের দ্বার সেইভাবে অবারিত ছিল না। সত্তর-আশির দশকের ছাত্রদের মানসিক চাহিদা বা দাবী তাঁর কাছে কখনোই পূরণ হতো না। তার ফলে গগনস্পর্শী পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও জনপ্রিয় শিক্ষক তিনি হতে পারেন নি। তাছাড়া, ১৯৮০ সালের পর থেকে নতুন নিয়ম অনুযায়ী, বিভাগীয় প্রধানের পদ দু'বছরের মেয়াদি (rotational) হতে শুরু করে। স্থায়ী প্রধানের পদের যে গুরুত্ব ও ভার থাকতো, তা নতুন ব্যবস্থায় কমে যায়। এই ব্যবস্থা তিনি কখনও মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। আবার, সত্তর-আশির দশক থেকেই বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চা নয়, পেশাগত প্রয়োজনেই গবেষণা যখন প্রায় আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ালো, তাঁর সঙ্গে তাল রেখে গবেষণা পরিচালকের যে নমনীয়তা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, অর্থাৎ তুলনায় সাধারণ মানের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে গবেষণা করানো, তা ড. ত্রিপাঠীর মানসিকতার পক্ষে অনুকূল ছিল না। তাঁর চোখের সামনেই তাঁর বিভাগের বেশ কিছু সতীর্থ অধ্যাপক গবেষণা পরিচালক হিসাবে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

এদিকে ষাটের দশক থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় রইলো না, একের পর এক আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করলো। তা সত্ত্বেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এইসব নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'মাদার ইউনিভার্সিটি' হিসাবে স্বাভাবিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। ড. সিন্‌হার আমলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত 'ইতিহাস পরিষদ' এবং 'ইতিহাস' পত্রিকা ও 'Bengal Past and Present' বঙ্গীয় ইতিহাসচর্চার প্রধান ভিত্তিভূমি ছিল। কিন্তু ড. ত্রিপাঠী কখনও দল বেঁধে ইতিহাসচর্চা সমর্থন করেন নি। তার ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চার স্বাভাবিক নেতৃত্বদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলো। গড়ে উঠলো অন্যান্য সংগঠন, যাদের জনপ্রিয়তা ও গণভিত্তি কলকাতা ইতিহাস বিভাগের প্রায় প্রতিস্পর্ধী হয়ে দাঁড়ালো। সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিহাসচর্চা পৌঁছে দেবার ব্যাপারে নিশীথরঞ্জন রায় বা গৌতম চট্টোপাধ্যায় মতো মানুষেরা যে কৃতিত্বের ছাপ রাখেন, ড. ত্রিপাঠীর পক্ষে তাও সম্ভব ছিল না। এককথায়, ড. ত্রিপাঠীর নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ অভূতপূর্ব খাড়া (vertical) উচ্চতায় পৌঁছেছিল, কিন্তু আনুভূমিক (horizontal) বিস্তৃতিতে তা প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। সম্ভবত, যুগের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে এই আত্মমগ্ন মানুষটি ক্রমশই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন ও আরো বেশি করে অভিমানী হয়ে ওঠেন।

অবসর গ্রহণের পর আরো প্রায় এক দশক ড. ত্রিপাঠী জীবিত ও কর্মক্ষম ছিলেন। শেষের দিকে দু-তিন বছর দুরারোগ্য কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়েও তাঁর জ্ঞানচর্চায় কোনও ছেদ পড়েনি। পড়া ও লেখায় তিনি ছিলেন সমান অক্লান্ত। ঘটনাচক্রে তাঁর কিছুটা নিকট প্রতিবেশি হবার সুবাদে এই পর্যায়ে ড. ত্রিপাঠীর এক নতুন রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলাম। গাম্ভীর্য ও উন্নাসিকতার খোলস ছেড়ে বৃদ্ধ মানুষটি বেরিয়ে আসতে চাইছেন, দোকান বাজার ব্যাঙ্ক পোস্ট অফিস যাচ্ছেন, স্বভাবসিদ্ধ আভিজাত্য সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে মিশতে চাইছেন, মুদি দোকানের বয়স্ক মালিক শুধু নয়, তরুণ ও কিশোর দোকান-কর্মচারীদের সঙ্গেও গল্প করছেন, সাধারণ সুখ দুঃখের কথা বলছেন—অনেকের কাছেই ড. ত্রিপাঠীর এই রূপটি সম্পূর্ণ অভাবনীয়।

শুধু পণ্ডিত হিসাবেই খ্যাতি নিয়ে পরিণত বয়সে চলে গেছেন অধ্যাপক ড. অমলেশ ত্রিপাঠী। অধ্যাপক তপন রায়চৌধুরী যাঁকে যথার্থই আখ্যা দিয়েছেন 'রেনেশাঁস ম্যান' বলে, সেই মানুষটির এবং তাঁর সারাজীবনের কাজের সঠিক মূল্যায়নের ভার রইলো অনাগত ইতিহাসের হাতে।

সূত্রনির্দেশ :

প্রণব চট্টোপাধ্যায়—'আমার শিক্ষক ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী', কলকাতা, ২০১০।

অরুণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক' পত্রিকা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮।

অর্পিতা গায়েন—'ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ও তাঁর ইতিহাস চেতনা : ১৯২১-১৯৯৮', এম. ফিল গবেষণা সন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।

মাস্টার

অভিজিৎ চক্রবর্তী

আজ এই ২০১২ সালেও, মহিলা বিজ্ঞানীদের সংখ্যা পুরুষ বিজ্ঞানীর তুলনায় নগণ্য। বিজ্ঞানের ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যদিও তুলনামূলক। আমার কাছে সঠিক পরিসংখ্যান নেই, তাই বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়ছে এমন ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রদের থেকে বেশি হলেও অবাক হব না। অথচ কলকাতা শহরের দু-তিনটি গবেষণাকেন্দ্রের কমবেশি ১০০ জন বিজ্ঞানীর মধ্যে বড়জোর ১৫ বা মেরেকেটে ২০ জন মহিলা। এই বিষয়টি নিয়ে প্রথমেই একটু আলোচনা না করে নিলে বিশিষ্ট রসায়নবিদ, প্রয়াত অধ্যাপক শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের জগৎটি বুঝে নিতে আমাদের ভুল হয়ে যেতে পারে। আমার অনেক বিজ্ঞানী সহকর্মী আজও মেয়েদের তাঁদের গবেষণাগারে জায়গা দিতে নারাজ। বিবাহিত মেয়েদের ক্ষেত্রে তা আরও সত্য। যুক্তিটি হল, বছর দু-তিনের মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে যাবে, তারপর সন্তান হবে এবং তারপর তাদের গবেষণায় সময় দেওয়া মুশকিল হয়ে পড়বে। ঐ বিজ্ঞানীর কারখানায় উৎপাদন এতে খানিকটা ব্যাহত হবে। তাঁরা অবশ্য মুখে মোটেও তা বলেন না। বলেন, এই ছাত্রীটি অন্য অমুক একটি বিষয়ে কাজ করার জন্য বেশি উপযুক্ত। সেই বিষয়, বলাই বাহুল্য, অনেকটা কম কায়িক পরিশ্রম দাবী করে। এই যুক্তি শুনে, আমার সবসময়েই মনে পড়ে মাস্টারের কথা—মাস্টার মানে অধ্যাপক শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়। মনে পড়ে এমনকি ৮৫ বছর বয়সেও তাঁর গবেষণাগারে দিনে অন্তত ৮ ঘন্টা গবেষণার কাজ ও পড়াশুনোর মধ্যে কাটানোর কথা।

আমরা তাঁকে মাস্টার বলতাম। একবার ভেবেছিলাম, এই লেখার শিরোনাম হবে মায়েস্ত্রো। সেক্ষেত্রে অবশ্য বিজ্ঞান-গবেষক হিসেবে যে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছনোর দরকার তা আমার মতে সত্যেন বোস আর সি ভি রমন ছাড়া আর কোন ভারতীয় বিজ্ঞানী পৌঁছননি। তাই মাস্টারই থাকল। আসা যাক আমাদের আলোচ্য মাস্টার শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের বিষয়ে। তাঁকে আমি মূলত একজন বিজ্ঞানী-গবেষক হিসেবেই দেখেছি। খুব নাম করা শিক্ষক ছিলেন। পড়াতেন অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি বা জৈব রসায়ন। স্পেশাল ক্লাসে পড়াতেন ন্যাচারাল প্রডাক্ট-এর অরগ্যানিক কেমিস্ট্রি। যেখানে ওঁর মাস্টারি। খুব সহজ করে পড়াতেন। এই সহজ করে পড়ানোর ঘরানা বাংলার শিক্ষক মহলে খুবই জনপ্রিয়। উনিও জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন। আমি প্রথম তাঁর ক্লাস করি ১৯৮২ সালে। উনি তখন সব অর্থে পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত। আমার অবশ্য এই সরল করে পড়ানোর রাস্তাটি তেমন পছন্দ নয়। এতে অতিসরলীকরণের পাল্লায় পড়তে হতে পারে। যা নাকি ক্ষেত্র বিশেষে ছাত্রছাত্রীকে ভুল রাস্তায়ও নিয়ে ফেলতে পারে। বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয় তো সহজ নয়! কিছু কিছু বরং খুবই জটিল। মাস্টার তবে আমার আইকন হলেন কী করে? এক কথায়, তাঁর গবেষক সত্তা দিয়ে। এখন বুঝতে পারি, বিজ্ঞান গবেষকের অধ্যবসায়ই আসল। পাশাপাশি তাঁর সারল্য, সবাইকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতায় এবং সর্বোপরি এই বিশ্বাস একটি ছাত্রের মনে গেঁথে দেওয়ায়—একবার চেষ্টা করে দ্যাখ, তুইও পারবি। মাস্টারের সাজপোশাক ও শরীরের ভাষায় আত্মপ্রত্যয় ছিল অসামান্য। ছাত্র থাকাকালীন বিজ্ঞান-